# এস. জি. আর. ওয়াই. রূপায়ণের কার্য্যকরী রূপরেখা

গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অভাবের বড় কারণ হল সারা বছর কাজ না পাওয়া। তাই মজুরীভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের আরো কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা অনেক বছর ধরে করা হচ্ছে। ২০০১-২০০২ আর্থিক বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা প্রকল্প যেটি এস.জি.আর.ওয়াই নামেও পরিচিত এই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ সাল থেকে এই যোজনার দুটি ধারা এস.জি.আর.ওয়াই-১ এবং এস.জি.আর.ওয়াই-২ মিলে গিয়ে শুধু এস.জি.আর.ওয়াই নামে চালু থাকবে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল খেটে খাওয়া মানুষকে আরো মজুরী ভিত্তিক কাজের সুযোগ করে দেওয়া। সুতরাং এই যোজনায় এমন প্রকল্প নেওয়া উচিৎ যার মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ আরো উন্নত হয় এবং তা আগামী দিনে দারিদ্র্য দূর করতে সহায়ক হয়।

সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনার অন্তর্গত প্রকল্প সঠিক রূপায়ণের জন্য ইতিপূর্বে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে - ২৭.১১.২০০২ তারিখের ৭৩৪৮-আর.ডি(এসজি.আর.ওয়াই)/১এস-২/২০০২নং আদেশ দ্রষ্টব্য। তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে যে এই যোজনায় রূপায়ণ আশানুরূপ হচ্ছে না। বছরের বরাদ্দ টাকা অনেক জেলাতেই সবটা খরচ হচ্ছে না ; সিদ্ধান্ত নিতে অযথা দেরী হচ্ছে, কাজের তদারকী ঠিকমত হচ্ছে না, খুবই ছোট ছোট প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ তৈরী হচ্ছে না, সম্পদ তৈরীর হিসাব ঠিক মত রাখা হচ্ছে না ইত্যাদি। গ্রামের মানুষের কাছে এই প্রকল্পের ধারণাগুলিও সঠিক ভাবে পৌঁছানো হচ্ছে না। এই সব ঘাটতি দূর করতে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে কি করতে হবে তা নীচে বলা হল।

১) প্রত্যেক আর্থিক বছরের মেয়াদ শুরু হবার আগেই এবং সম্ভব হলে জানুয়ারী মাসেই প্রতিটি জেলা পরিষদ / দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে অতি অবশ্যই বিগত বছরের বরাদ্দের সমান মূল্যের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই কর্মপরিকল্পনার একটি অনুমোদিত প্রতিলিপি ঠিক ওপরের স্তরে পাঠাতে হবে। পরিকল্পনাগুলি তৈরী করতে হবে গ্রাম-সংসদ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে। অন্তত কিছু প্রকল্প, যেগুলি খুবই জরুরী তার এস্টিমেট তৈরী করে টাকা বরাদ্দ হওয়ার আগেই কারিগরি অনুমোদন (ভেট) করে রাখতে হবে। দুই লাখ টাকা পর্য্যন্ত প্রকল্প রূপায়ণ করবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও দুই থেকে দশ লাখ পর্যন্ত প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব থাকবে পঞ্চায়েত সমিতির। কারিগরি দিক থেকে খুব শক্ত কাজ না হলে জেলা পরিষদের সরাসরি কোন কাজ না করাই ভাল। এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ৭ই জুলাই ২০০৩ তারিখের ২৩৬০/পি.এন/ও/১/১এস-১/২০০৩ নং আদেশ দ্রষ্টব্য। জেলার মোট খরচের অন্তত ষাট শতাংশ মজুরী খাতে খরচ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে কোন একটি প্রকল্পের জন্য এই অনুপাত রক্ষা না হলেও চলবে। অন্যান্য কর্মসূচীর বরাদ্দ বা পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে নগদ টাকা মালমশলা কেনার জন্য ব্যবহার করে এস.জি.আর.ওয়াই থেকে মজুরী বাবদ খরচ যুক্ত করে প্রকল্প রূপায়ণ করা যাবে।

২) গ্রামের মজুররা কাজ পান মূলত কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে। এই সবের সুযোগ বাড়াতে হবে। তারজন্য পুকুর,ডোবা ও খাল-বিলগুলি ভাল করে সংস্কার করা দরকার যাতে সেচের সুযোগ ও মাছের চাষ বাড়ানো যায়। এ ছাড়াও জল-বিভাজিকা ভিত্তিক জল ও মাটি সংরক্ষণ, সামাজিক বনসৃজন, পতিত জমি উদ্ধার করে গাছ লাগানো বা পশুখাদ্য লাগানো ইত্যাদি কাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সামগ্রিক ভাবে এমন সংখ্যক গাছ লাগানো দরকার যা থেকে এলাকার মানুষের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল কর্মসূচির জন্য প্রয়োজীয় জ্বালানীর সরবরাহ করতে পারে। মাটির নীচের জল বেশী ব্যবহার হচ্ছে যা বিপদজনক। মাটির উপরে যতটা সম্ভব জল ধরে রাখতে হবে। জল বৃষ্টি পড়লে আবার পাওয়া যাবে কিন্তু মাটি ধুয়ে গেলে তা আর ফিরে আসবে না। তাই মাটি সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেচের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান জল ব্যবহার করতে দেওয়ার শর্তে ব্যক্তিগত পুকুরও সংস্কার করা যাবে। প্রয়োজনে সেখানে স্বনির্ভর দলকে দিয়ে মাছ চাষও করানো যাবে। যে সব অঞ্চলে জলের অভাবের জন্য বছরে মাত্র একটা ফসল হয় বা কোন ফসল হয় না সেখানেও কি ভাবে জমিতে অন্তত দুটি ফসল ফলানো যায় তার জন্য পরিকল্পনা করে তা রূপায়ণ করতে হবে। যে জমিতে কোন ফসলই হবে না সেখানে খুব কম জলেও বেড়ে ওঠে এমন গাছ লাগাতে হবে যাতে তা থেকেও কিছু রোজগার হয়। গরীব তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের মালিকানায় এই রকম অনুর্বর জমি থাকলে সেই জমিকে কৃষির উপযোগী করে তোলার খরচ ঐ পরিবারকে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত অংশ থেকে দেওয়া যাবে। তারা নিজেরাই শ্রম দিয়ে জমিকে উৎপাদনে নিয়ে আসবে। অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মতই সামাজিক পরিকাঠামো বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দুপুরের খাবার রান্না করার মত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ী তৈরী করা, হেল্থ সাব-সেণ্টার ও অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের জন্য বাড়ী তৈরী করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পাকা নর্দমা তৈরী করা, খাদ্য শস্য রাখার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েতের নিজস্ব গোডাউন তৈরী করা ইত্যাদি কাজগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক বরাদ্দের ত্রিশ শতাংশ টাকা খরচ করতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সামাজিক পরিকাঠামো তৈরীতে। যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত তার বরাদ্দ টাকা থেকে এই খাতে প্রকল্পের মোট খরচের এক চতুর্থাংশ দিতে রাজী হবে তাদের উৎসাহ দিতে সেখানেই প্রকল্পগুলি নিতে হবে। আরো দশ শতাংশ টাকা খরচ করতে হবে বন সৃজন ও পরিবেশ উন্নয়নের কাজে। তাছাড়াও সমস্ত কাজের অর্ধেক টাকা ব্যয় করতে হবে তফসিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। বাকী টাকা কেবল রাস্তা ঘাট তৈরীর কাজে খরচ না করে পূর্বেই যে রকম বলা হয়েছে পুকুর খাল বিল সংস্কার সহ জল ও মাটি সংরক্ষণের জন্যই মূলতঃ খরচ করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দের টাকা থেকে ২২.৫ শতাংশ টাকা তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের ব্যক্তিগত উপকারে লাগবে এমন প্রকল্পে ব্যয় করতে হবে। এই প্রকল্প অবশ্যই মজুরী ভিত্তিক হবে। যেমন ঐ ধরণের কোন পরিবারের পতিত জমি বা পুকুর থাকলে তা উদ্ধার

করা বা সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যা আগেই বলা হয়েছে। তারা ঐ জমি থেকে আয় বাড়াতে যদি কোন প্রকল্প নেন তার মজুরী ঐ ব্যক্তিকে এস.জি.আর.ওয়াই থেকে দেওয়া যাবে। স্থায়ীভাবে উৎপাদন বাড়বে এবং তা থেকে পরিবারের রোজগার হবে এই ধরণের মজুরী ভিত্তিক প্রকল্পগুলিই এই বরাদ্দের অংশ থেকে খরচ করতে হবে। এ ছাড়াও, তফসিলি জাতি বা উপজাতি মহিলা বা পুরুষ যদি স্বনির্ভর দল তৈরী করে থাকেন তা হলে দলের কাজেও এই ২২.৫ শতাংশ বরাদ্দ থেকে খরচ করা যাবে। কোথাও কোথাও এই বরাদ্দ থেকে গবাদি পশু, রিক্সা ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কিনে দেওয়া হচ্ছে বা বাড়ী মেরামতির জন্য টাকা দেওয়া হয় যা বাঞ্ছনীয় নয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দের আরো অন্তত দশ শতাংশ টাকা খরচ করতে হবে শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সামাজিক পরিকাঠামো নির্মানে। মোট প্রকল্পের চার ভাগের এক ভাগ টাকা দেবে গ্রাম পঞ্চায়েত। বাকী তিন ভাগ দেবে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি। এ ছাড়াও আরো অন্তত দশ শতাংশ টাকা খরচ করতে হবে বন সৃজন ও পরিবেশ উন্নয়নের কাজে।

স্হানীয় প্রয়োজনভিত্তিক চারাগাছ রোপনে জনগণকে উৎসাহিত করবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্বল্পমূল্যে চারাগাছ বিক্রয় করার ব্যবস্হা করা যেতে পারে । এই ব্যবস্হার ফলে পঞ্চায়েতের রোজগার বাড়বে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের বরাদ্দ টাকায় ঐ সব পরিবারকে বিনামূল্যে অর্থকরী গাছের চারা দেওয়া যেতে পারে।

৩) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সমুহ ছাড়াও যদি কোন সময় কোন প্রকল্প আপৎকালীন ব্যবস্হা হিসাবে জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় তবে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েত /পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে প্রধান /সভাপতি/ সভাধিপতির অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে। তবে সেসব ক্ষেত্রে কারণ সহ লিখিত নির্দেশ নিতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট সমস্ত পঞ্চায়েত সংস্হার অনুমোদন নিতে হবে ।

৪) সংশ্লিষ্ট বাস্তুকার মহাশয়ের প্রয়োজনীয় কারিগরী অনুমোদন (ভেটিং) ছাড়া কোন প্রকল্পে কাজ শুরু করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) আনুমানিক ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়সম্বলিত প্রকল্প ব্লকস্তরে অবর সহ-বাস্তুকার (SAE) অনুমোদন করবেন।

খ) আনুমানিক ১,০০,০০১ টাকা থেকে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়সম্বলিত প্রকল্প সমূহ জেলাপরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে নিযুক্ত সহ-বাস্তুকার ( Assistant Engineer) অনুমোদন করবেন। দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদে নিযুক্ত সম-পদমর্যাদাসম্পন্ন বাস্তুকার উক্ত পার্বত্য পরিষদের উক্ত মূল্যের প্রকল্পসমুহ অনুমোদন করবেন।

গ) ৫,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে আনুমাণিক ব্যয়সম্বলিত প্রকল্প সমূহ জেলাপরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বাস্তুকার অনুমোদন করবেন। দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য

পরিষদের ক্ষেত্রে পার্বত্য পরিষদের সম-পদমর্যাদাসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ অনুরূপ প্রকল্পসমুহ অনুমোদন করবেন।

৫) প্রকল্পের সুষ্ঠ এবং যথাযথ রূপায়নের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন এবং তদারকি প্রয়োজন। প্রকল্প রূপায়নকালে প্রশাসনিক ও পঞ্চায়েত কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত বাস্তকার প্রকল্প শুরু হওয়ার পর কাজের অগ্রগতি ও কাজের মান নিয়মিত তদারকি করবেন এবং প্রকল্পে ব্যবহৃত মালপত্রের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য মালপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্হা করবেন ।

৬) প্রকল্প রেজিস্টারে প্রতিটি প্রকল্পের ক্রমসংখ্যা, গ্রামপঞ্চায়েত /পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদের অনুমোদনের তারিখ, কাজ শুরু ও শেষ করার তারিখ, অনুমোদিত আনুমানিক ব্যয়, প্রকল্প রূপায়নের সময়সীমা, প্রকৃত ব্যয়, মোট শ্রম দিবস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রকল্প রেজিস্টারের একটি ছক বই-এর শেষে পরিশিষ্টে দেওয়া হল। প্রতি বছরের জন্য প্রকল্পের ক্রমসংখ্যা এক নম্বর থেকে শুরু করতে হবে। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট বাস্তুকার দ্বারা পুনরায় অনুমোদন করাতে হবে, প্রকৃত ব্যয় কোন কারণে অনুমোদিত ব্যয়ের থেকে বেশী হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত /পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদ-এর কাছ থেকে ঐ বাড়তি ব্যয়ের পূর্বেই অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পগুলো সাধারণ ভাবে কয়েক মাসের মধ্যে এবং বিশেষ কারণে সর্বাধিক এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৭) সংশ্লিষ্ট বাস্তকার বা জব অ্যাসিস্ট্যান্ট/নির্মান সহায়ক কাজের অগ্রগতি পরিমাপ বইতে (Measurement Book / Measurement sheet) নিয়মিত লিপিবদ্ধ করবেন। কাজের অগ্রগতি বা কতটা মালপত্র ব্যবহার হয়েছে বা পাওয়া গেছে তা না মেপে মজুরী বা মালপত্রের দাম দেওয়া যাবে না। প্রকল্প সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকল্প রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক শেষ দফার খরচ মঞ্জুর করবেন।

৮) প্রকল্প রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সঠিক সময়ে পাওয়ার জন্য এবং যথাযথ গুণমান বজায় রাখার জন্য আগাম দরপত্র আহ্বান করতে হবে। বছরের শুরুতেই যা আনুমানিক প্রযোজন তার ভিত্তিতে দরপত্র নেওয়া যাবে। তার ফলে টাকা পেলেই কাজ শুরু করা সহজ হবে।

৯) সমকাজে সমমজুরীর ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের নীতি গ্রহণ করতে হবে। মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ করা চলবে না।

১০) মজুরীর টাকা সপ্তাহে একবার দিতে হবে । সুতরাং প্রতি সপ্তাহেই কাজের পরমাপ করতে হবে এবং যতটা কাজ হয়েছে সেই মত মজুরী দেওয়া যাবে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় অনুযায়ী পে মাস্টারকে এক সপ্তাহের মজুরীর টাকা অগ্রিম হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। মাল-পত্র কেনার টাকা পে-মাস্টারকে দেওয়া যাবে না। তবে ওই অগ্রিম অর্থের পরিমাণ কখনোই ওই প্রকল্পে মজুরী বাবদ ধার্য্য মোট অর্থের ২৫% বেশী হবে না। মাল-পত্র গ্রাম-পঞ্চায়েত টেণ্ডার অথবা দরপত্র আহ্বান করে সরাসরি কিনবে ও তা স্টক রেজিষ্টারে তুলে দাম মেটাবে। ৫০০/- ( পাঁচ শত) টাকার বেশী হলে দাম অবশ্যই চেকে দিতে হবে। কোন

অবস্হাতেই আগে দেওয়া (অ্যাডভ্যান্স) টাকার হিসাব সঠিক ভাবে না বুঝে নিয়ে পরবর্তী টাকা অগ্রিম হিসাবে দেওয়া যাবে না। পে- মাস্টারকে অন্তত কুড়ি জন শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য অর্ধদক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্য একদিনের মজুরী দিতে হবে। তাকে নিয়মিত কাজের তদারকি করতে হবে এবং কাজের পরিমাপের হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।

১১) কর্মক্ষেত্রে খাদ্যশস্য (চাল ) বিতরণ করতে পারাই সুবিধাজনক। অন্তত পাঁচ কেজি খাদ্য শস্য এবং মজুরীর অন্তত এক চতুর্থাংশ নগদে দিতে হবে। এফ.সি.আই চাল না দিতে পারলে পুরো মজুরী ব্যতিক্রমি ব্যবস্থা হিসাবে নগদে দেওয়া যাবে। তবে খাদ্যশস্য দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টাই করতে হবে।

১২) বিতরিত খাদ্যশস্যের পরিমাপ পে মাস্টার অতি অবশ্যই মাস্টার রোলে স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করবেন । জেলাপরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ/দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ / পঞ্চায়েত সমিতি / গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পৃথক পৃথকভাবে স্টক রেজিষ্টার রাখতে হবে। সেখানে প্রাপ্ত এবং বিতরিত খাদ্যশস্যের সঠিক পরিমাণ উল্লেখ করা থাকবে। কোথাও কোথাও কেবলমাত্র ডিলাররা এই স্টক রেজিস্টার রাখেন যা অত্যন্ত অনুচিৎ। পঞ্চায়েতকেই এই স্টক রেজিষ্টার রাখতে হবে।

১৩) মাসে অন্তত একবার গ্রামপঞ্চায়েত /পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদে এই প্রকল্পের অগ্রগতির পর্য্যালোচনা করা উচিৎ। এই সভায় সংশ্লিষ্ট বাস্তুকার এবং অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দের উপস্হিতি দরকার। এই যোজনা রূপায়নে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যিক। তিনি যেমন স্বয়ং সরজমিনে প্রকল্প রূপাযনের অগ্রগতি পরিদর্শন করবেন তেমনি প্রতি মাসে তাঁর এলাকায় কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করবেন।

১৪) যদি কেউ কোন স্কীমের মাস্টার রোল অথবা ভেটেড এস্টিমেটের কপি চান, তবে তাঁর কাছ থেকে কপি করার খরচ নিয়ে, কপি সরবরাহ করতে হবে।

১৫) বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপূর জেলায় কর্মসুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প (EAS) এবং খরা প্রবণ এলাকা প্রকল্পের (DPAP) ১ম ও ৬ষ্ঠ পর্যায়ে গৃহীত যে সমস্হ জল বিভাজিকা প্রকল্প অসমাপ্ত অবস্হায় রয়েছে, সেসব প্রকল্প ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছর থেকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ থেকে মেটানোর জন্য বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। এর জন্য পৃথক প্রকল্প অনুমোদন করবার প্রয়োজন নেই। উক্ত জল বিভাজিকা প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজগুলিকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনার বার্ষিক কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হবে । সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনার প্রকল্পে জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত - এই তিন স্তরে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। উক্ত অসমাপ্ত জলবিভাজিকা প্রকল্পসমুহ সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যে কোন স্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট জেলাপরিষদকেই গ্রহণ করতে হবে ।

১৬) গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত জলের চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রামে অবস্হিত পুকুর/জলাধারগুলির পঙ্কোদ্ধার/পুনঃখননের মাধ্যমে জল ধরে রাখার ব্যবস্হা করতে হবে। তাছাড়া মাটীর নীচের জলস্তরে আরো যাতে বেশী করে জল ঢুকতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সব কাজ যেহেতু প্রধানত মজুরী নির্ভর তাই মজুরী ও

মাল-মশলার জেলা-ভিত্তিক সামগ্রিক অনুপাত বজায় রাখতে এই কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করা দরকার। সুতরাং এই কাজে আলাদা বরাদ্দের কথা না বলা থাকলেও জল সংরক্ষণের স্বার্থে ও এই যোজনার সামগ্রিক রূপায়ণের স্বার্থে এই ধরণের কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৭) গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এমন কোন পুকুর যদি চিহ্নিত করা যায় যে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর পরেও বাড়তি জলে গ্রামের অন্যান্য প্রকল্পে যেমন সেচ, মৎস্যচাষ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যায় সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদ জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কার করতে পারেন। এরকম পরিস্থিতিতে পুকুরের মালিকের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদ একটা চুক্তি করবেন যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একথা উল্লেখ করতে হবে যে পুকুরের জলতল বা গভীরতা একটা নির্দিষ্ট নিম্ন সীমায় পৌঁছালে তবেই তা শুধুমাত্র মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। উল্লিখিত জলতলের সীমারেখা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির করতে হবে। এই কাজের জন্য মালিকের সঙ্গে পঞ্চায়েতের কি চুক্তি হতে পারে তার একটি খসড়া বয়ান পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সাধারণ মানুষ যারা এই যোজনার রূপায়ণের সঙ্গে জড়িত তাদের সবাইকে যা বলা হল সেই বিষয়গুলি জানাতে হবে। তবেই সব স্তরের মানুষের এই যোজনায় অংশগ্রহণ বাড়বে। অনেক জেলাই এই যোজনায় বার্ষিক বরাদ্দ অনুযায়ী টাকা খরচ করতে পারছেন না ও যথেষ্ট শ্রমদিবস তৈরী হচ্ছে না। যারা খেটে খাওয়া জন মজুর তাদের এই কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে তাদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়। এই কাজে সব মানুষকে সামিল করা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া, অভাবের সময় প্রয়োজন মত জন মজুরদের কাজ দেওয়া ও তাদের কাজের সুযোগ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর তা দ্রুত খরচ করে ও তার হিসাব দিয়ে যাতে দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসেই দেওয়া সম্ভব হয় তার জন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। এই যোজনায় এমন অনেক প্রকল্প নেওয়া হয় যা মাঠ শুকনো না হলে করা যায়না। যেহেতু প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার কিছু দিন পরেই বর্ষা নেমে আসে তাই প্রারম্ভিক তহবিল ও প্রথম কিস্তির মোট টাকার অর্ধেক খরচ করতেই প্রায় ডিসেম্বর মাস হয়ে যায় ও দ্বিতীয় কিস্তি টাকা পাওয়ার পর মার্চ মাসের মধ্যে তা খরচ করা সম্ভব হয়না। তাই প্রারম্ভিক তহবিল ও প্রথম কিস্তির টাকার যাতে বেশীর ভাগই আগষ্ট মাসের মধ্যে শেষ করা যায় তার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার। সামাজিক পরিকাঠামো তৈরী ও বনসৃজনের কাজগুলি অতি অবশ্যই ঐ সময়ের মধ্যে করা দরকার। তবেই সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব। তফসিলী জাতি ও উপজাতি পরিবারের বা দলের সরাসরি উপকারে আসে এরকম প্রকল্প গুলিও আগষ্ট মাসের মধ্যে করে ফেলা দরকার। এর ফলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটা প্রায় সবটাই খরচ করা যাবে মাটীর কাজ সংক্রান্ত প্রকল্প যথা পুকুর, খাল, কুয়ো তৈরী করা, জল সংরক্ষণের কাজ করা, রাস্তা তৈরী করা ইত্যাদি কাজে বছরের শেষে যাতে

বরাদ্দের দশ শতাংশের বেশী টাকা না পড়ে থাকে তা পঞ্চায়েতের সব স্তরেই নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই চাটার্ড ফার্মকে দিয়ে অডিট করে নিতে হবে যাতে দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাবের সাথে এই অডিট সংক্রান্ত নথি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো যায়।

এই সব সাফল্য পেতে হলে প্রতিটি স্তরেই মাসিক পর্য্যালোচনা ও দূর্বলতাগুলি দূর করার ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই নির্বাচিত সদস্য এবং আধিকারিকদের প্রকল্পের কাজ চালু থাকার সময় ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

-

# ইন্দিরা আবাস যোজনা রূপায়ণের কার্য্যকরী রূপরেখা

দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারকে মজুরী ভিত্তিক কাজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয় ১৯৮৬ সাল থেকে। ঐ সব পরিবারের গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনও অনুভূত হয় সেই সময় থেকে। তখন ঐ সকল কর্মসংস্থান প্রকল্পের মধ্যেই অল্প সংখ্যক পরিবারকে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে আনার ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ইন্দিরা আবাস যোজনা চালু করা হয়। ইন্দিরা আবাস যোজনার উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবার যারা গৃহহীন বা বাসগৃহের মান খুবই খারাপ তাদের জন্য বাসগৃহ তৈরী করা।

## ইন্দিরা আবাস যোজনায় কারা ঘর পাবেন ?

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারের মহিলা এবং বিশেষক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী যুগ্মভাবে এই প্রকল্পের প্রাপক হবেন। বিধবা ও অবিবাহিতা মহিলারাও-এর আওতায় প্রাপক হতে পারেন। প্রাপকদের কমপক্ষে ৬০ শতাংশ তফসিলি জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় ভূক্ত হতে হবে এবং মোট প্রাপকের ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। ২০০৩-০৪ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ ক্ষেত্রে মাত্র কেবল মহিলাদের নামে দেওয়া হয়েছিল। এই যোজনার টাকা পারলে সবটাই মহিলাদের দিতে হবে।

## কী ভাবে প্রাপকের তালিকা তৈরী করা হবে ?

গ্রাম সংসদের সভায় দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারদের তালিকা থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপকদের নাম নির্বাচন করা হবে ও তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ঐ তালিকা এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন গ্রাম সংসদ থেকে প্রাপ্ত তালিকাগুলি থেকে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষিত নীতির (যথা গ্রাম সংসদের জন-সংখ্যার আনুপাতিক হার) ভিত্তিতে নেওয়া প্রাপকদের নিয়ে ঐ আর্থিক বছরের জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে ও অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জেলা পরিষদে পাঠানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুমোদিত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে লিখে রাখতে হবে। তালিকার কোন প্রাপক সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে জেলা পরিষদ উপযুক্ত তদন্ত করাবেন ও অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলবেন। পরবর্তী গ্রাম সংসদের সভা পর্যন্ত এই তালিকা কার্যকরী থাকবে। তবে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না - অর্থাৎ তারা যোগ্যতা অর্জন করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতেই হবে।

## তালিকা জেলা পরিষদে বছর শুরুর আগেই দিতে হবে

গ্রাম সংসদের নভেম্বর মাসের মিটিং-এ সাধারণত প্রাপকদের তালিকা তৈরী করতে হবে যাতে পরের মার্চ মাসের মধ্যেই তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদে পৌঁছে যায়। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ী তৈরী ও মেরামতির লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারী মাসেই গ্রাম-পঞ্চায়েতকে জানাতে হবে। যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েত অযথা বিলম্ব করে তা হলে তাদের আর একবার সুযোগ দেওয়ার

পর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ টাকা যেখানে খরচের হার ও রূপায়ণের মান ভাল এমন গ্রাম পঞ্চায়েতে খরচ করা যাবে।

**কী ভাবে টাকা দেওয়া হবে ?**

ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীন নতুন গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা এবং পুরনো গৃহসংস্কারের জন্য এই পরিমাণ ১০,০০০ টাকা।

জেলা পরিষদে বরাদ্দ টাকা আসার এক/দুই দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে। প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে এই প্রকল্পের প্রাপকদের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া গেছে। জেলা পরিষদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তালিকা অনুযায়ী টাকা ছাড়ার জন্য জেলা পরিষদের অনুমোদন নেওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকই এই টাকা ছাড়তে পারবেন।

টাকা পাওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে সব প্রাপকদের গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেকে চেকের মাধ্যমে পারো টাকাই বন্টন করতে হবে। এ জন্য সব প্রাপকদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এই কাজ সারা জেলা জুড়ে একদিনে করলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে ১২.৯.২০০২ তারিখের ৫৫৯৯(৩৬)-আর.ডি/আই.এ.ওয়াই-নং সম্বলিত একটি নির্দেশিকা জেলায় পাঠানো হয়েছে। প্রাপকদের নামের তালিকা তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রকাশ্য স্থানে রং তুলি দিয়ে লিখতে হবে যাতে অফিস বন্ধ থাকলেও সবাই প্রাপকদের নাম জানতে পারেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং ভাল অর্থাৎ টেকসই বাড়ী তৈরি করার পদ্ধতি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। প্রাপককে তার নিজের অর্থ একই সঙ্গে খরচ করে আরো মজবুত ও স্থায়ী বাড়ী তৈরী করতে উৎসাহ দিতে হবে। বাড়ী কমপক্ষে ২০ বর্গ মিটার হওয়া চাই। সাথে ধূয়াহীন চুল্লী ও স্যানিটরি পায়খানা থাকতেই হবে। প্রাপক নিজের পছন্দমতো ঘর তৈরীর সামগ্রী কিনতে পারেন ও স্যানিটরি পায়খানার সরঞ্জাম পঞ্চায়েত সমিতি সুপারিশকৃত স্যানিটরি মার্ট থেকে নিতে পারেন। স্যানিটারি পায়খানার নির্মাণে কোনওভাবে তিন/চার হাজার টাকা দেওয়া যাবে না। গ্রামীণ স্যানিটেশন কর্মসূচীর কমদামের মডেলে স্যানিটারি পায়খানা তৈরী করতে হবে। টাকা বন্টন হওয়ার দিনই প্রাপকদের স্বাক্ষর সহ ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পঞ্চায়েত সমিতিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দিতে হবে। প্রথম ৫০ শতাংশ টাকা খরচ হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন আধিকারিক পরিদর্শন করবেন ও টাকার সমপরিমাণ কাজ হয়েছে দেখলে পরের ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করবেন ও ঐ সুপারিশ অনুসারে প্রাপককে পরের ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়া হবে। বাড়ী সম্পূর্ণ হলে প্রাপককে নিয়ে বাড়ীর একটি ছবি তুলে তা অ্যালবামে রাখতে হবে। প্রতি বছরের জন্য একটি করে অ্যালবাম তৈরী হবে।

মহকুমা শাসকদের এই কর্মসূচীর অগ্রগতি তদারকি করতে হবে এবং বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করার ফাঁকে তারা ইন্দিরা আবাস যোজনায় নির্মিত গৃহ পরিদর্শন করবেন।

**এই যোজনায় প্রাপ্ত টাকার ২০ শতাংশ একই পদ্ধতিতে গৃহসংস্কার কাজের জন্য ব্যয় করা যাবে**

**এই যোজনার রূপায়ণের দূর্বলতাগুলি এখনই দূর করতে হবে।**

এই যোজনার রূপায়ণে বেশ কিছু দুর্বলতা নজরে এসেছে ও তার প্রতিকারের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে বিভিন্ন সময়ে জানানো হয়েছে।

সবচেয়ে বড় দূর্বলতা হল বেশ কিছু জেলায় ইন্দিরা আবাস যোজনার বার্ষিক বরাদ্দের তুলনায় সারা বছরে কম টাকা খরচ হওয়া এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাড়ী তৈরী করতে না পারা। দেখা যাচ্ছে যে সঠিকপরিকল্পনা ও পরিচালনার ত্রুটির জন্য গরীব পরিবারেরা বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বরাদ্দ টাকা খরচ না হয়ে পড়ে থাকছে। এজন্য কয়েকটি জেলা শেষ পর্যন্ত বার্ষিক বরাদ্দের চেয়ে কম টাকা পাচ্ছে ও জেলায় কম বাড়ী তৈরী হচ্ছে। এই দুর্বলতার কারণগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

১। এই কর্মসূচির অধীন বার্ষিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা জেলা পরিষদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বছরের শুরু হওয়ার আগেই জানানো হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন বরাদ্দ না জানান হলেও গত বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাতে হবে।

২। বছর শুরু হওয়ার আগেই যাদের বাড়ী তৈরী হবে তাদের তালিকা তৈরী হয় না এবং তা জেলা পরিষদে জানানো হয় না।

৩। সাধারণত গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার পর প্রাপকদের তালিকা তৈরী করে এবং তাতে অযথা দেরি হয়।

৪। গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত তহবিলের অর্থ **সময়মতো** পাঠানোর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে।

৫। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত এখনো বরাদ্দ টাকা পাওয়ার পর তার অর্ধেক মাত্র প্রাপকদের প্রথম কিস্তি হিসাবে দিয়ে বাকী টাকা নিজেদের কাছে রেখে দেন যাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সহজেই দেওয়া যায়। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কারণ জেলা পরিষদকে দেওয়া টাকার অর্ধেক খরচ হলে তবেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার প্রস্তাব পাঠানো যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতেই যদি অর্ধেক টাকা প্রথম দফায় বণ্টিত না করে জমিয়ে রাখে তা হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেই বছর গড়িয়ে যায়। এর ফলে অনেক জেলা দ্বিতীয় কিস্তিতে পুরো টাকা পায় না। (আবার কয়েকটি জেলা দ্রুত কাজ করে অনেক আগেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পায় এবং তা খরচ করে এমন কি তৃতীয় কিস্তিতে টাকা পায় যা জেলার বার্ষিক বরাদ্দের চেয়ে বেশী)। জেলায় যদি কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতও টাকা বন্টন না করে আটকে রাখে তা হলে সারা জেলাকেই পিছিয়ে পড়তে হয়। তাই প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই দ্রুত টাকা বন্টন করার শৃঙ্খলা মানতে হবে অথবা পরের বার তাদের বরাদ্দ কমাতে জেলা পরিষদ বাধ্য হবে।

৬। টাকা বন্টন ব্যবস্থায় ত্রুটি, যথা- সঠিক প্রাপককে টাকা না দেওয়া বা কম টাকা দেওয়ার অভিযোগও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। সব প্রাপকদের নাম, ঠিকানা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরের দেওয়ালে রং-তুলি দিয়ে অবশ্যই লিখে রাখতে হবে যাতে সবাই প্রাপকদের নাম জানতে পারেন।

৭। টাকা বন্টন হওয়ার পর মাষ্টার রোল সহ ইউটিলাইজেশন দিতে দেরী করা ও জেলা পরিষদে সময় মত অডিট না করা ইত্যাদি ত্রুটিগুলিও দূর করতে হবে।

এই সব ত্রুটিগুলি যাতে দূর করা যায় তার জন্য প্রতিটি জেলায় সমস্ত স্তরের পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-সংসদগুলিকে বিশেষ ভাবে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮। ইন্দিরা আবাস যোজনাতে যে সকল বাড়ী তৈরী করা হবে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে মাটি দিয়ে তৈরী না করাই ভাল। লক্ষ্য রাখতে হবে যাহাতে বাড়ীগুললি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ও ঝড় বৃষ্টি তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগে থাকতে পারে।

৯। সব গ্রাম পঞ্চায়েতেই টাকা ঠিক মত ছাড়া হয়েছে কিনা এবং কাজের গুণগত মান বজায় থাকছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি হওয়া দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা ও জেলাস্তরে প্রতি মাসে এই অগ্রগতি পর্য্যালোচনা হওয়া দরকার যা সব সময় করা হয় না।

নভেম্বর মাস নাগাদ প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে অতিরিক্ত (প্রয়োজন অনুযায়ী) কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করে রাখতে হবে যাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকার সদ্ব্যবহার মার্চ মাসের মধ্যেই করা যায়।

এই সব ত্রুটিগুলি যাতে দূর করা যায় তার জন্য প্রতিটি জেলায় সমস্ত স্তরের পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-সংসদগুলিকে বিশেষ ভাবে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

-